International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-X, November 2015, Page No. 1-6
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

রাস উৎসব ও শোলাশিল্প-বর্তমান অবস্থান ও অভিমুখ

কুন্দন ঘোষ
অংশ কালীন শিক্ষক, নৃতত্ত্ব বিভাগ, বিবেকানন্দ মহিলা মহাবিদ্যালয়, বরিশা, কলকাতা, ভারত

Abstract

Rash festival (utsav) is one of the popular festivals of W.B. held on month of Kartik. It is celebrated to celebrate love and union of Lord Krishna with his Gopis, called Rashlila. The most important day of the festival is observed on the full moon day (purnima) in Kartik month, known as Rash purnima.

The Vaishnavas decorate stage and pandals with various types of shoal articles like rash tree, Astosokhi, rashpots and rash rachanas. They are well decorated with light and various types of Shola aricles. The Malakar community makes fourteen types of Rash rachana, like various fruits, birds, fish etc. during the manufacturing process the craftsmen are focus on aesthetic sence of the products. With these symbolic sholapith articles they try to create an artificial environment of Brindaban.

The present paper has attempted to study the production and marketing process of Sholapith craft and its changing dynamics during the Rash utsav. Here the current paper will throw a luminous focus on three Sholapith craft cluster of W. B. for emphasis on this issue. To fulfil the purpose of this research study both primary and secondary data has been used.

It is found that modernization and globalisation influences the decrease use of Shola articles during Rash festival. With changing situation and emergence of alternative products, this traditional craft have to face some competition. Recently peoples from other communities also engaged in this craft.

Key Words: Sholapith craft, craftsmen, Malakar, Rash utsav, aesthetic sense.

রাস উৎসব : রাস উৎসব হয় কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে। রাস বৈষ্ণবদের উৎসব। 'কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একটি প্রধান ও বঙ্গদেশের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব। ইহা শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ যাত্রার অন্যতম। পুরাণে আছে এদিন কৃষ্ণ রাধিকা বৃন্দাবনে গোপিনীমন্ডলে নৃত্যোৎসব করেছিলেন। এরই স্মারক হিসেবে কার্তিকী পূর্ণিমা থেকে তিনদিন ব্যাপী রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।'[১]

রাসমঞ্চ সাজানোর জন্য শোলার ব্যবহার দেখা যায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে। রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে শোলাশিল্পীরা বিভিন্ন শোলার পুতুল তৈরি করেন। ঐ সব শোলার পুতুল দিয়ে রাসমঞ্চ সাজানো হয়। 'কৃষ্ণ রাধার পুতুল প্রমাণ মূর্তি রাসমঞ্চের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে এরা আত্মা ও শরীরের অভিন্নতার দর্শনের (কৃষ্ণ আত্মার প্রতিভূ এবং রাধা দেহের বা শরীরের) অভিব্যক্তির প্রকাশ করে থাকেন।'[২] কোথাও কোথাও রাসলীলায় শোলার জন্তুজানোয়ার এবং জাল দিয়ে ইন্দ্রজাল অত্যাবশ্যক শোলা সামগ্রী। ইন্দ্রজাল বুনতে বিভিন্ন রাস রচনা ব্যবহার করা হয়।

'শোলার রাসমঞ্চের ওপর ফুল দিয়ে তৈরি জালের অন্তরালে রাধা ও কৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ জালের গায়ে শোলার তৈরি নানা পশুপাখি আটকানো থাকে। মায়াময় পার্থিব জগতের প্রতীক বলে এটির নাম ইন্দ্রজাল বা মায়াজাল। যে বেদীর ওপর যুগল মূর্তি স্থাপিত হয়, সেটিও নানারকম শোলার ফুল, পাতা, লতা, কলকা এবং বিভিন্ন পশু ও পাখীর আকৃতি যেমন

হাতী, ঘোড়া, কুমীর, বাঁদর, টিয়া, কাকাতুয়া, হাঁস, ময়ূর এবং শোলার কদম ফুল গাছ ও কদমগাছ দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে।'[৩]

শোলাশিল্পীরা রাস উপলক্ষে অষ্টসখী তৈরি করেন। এই আটজন সখী হল- ললিতা, বিশাখা, বাসুদেবী, সুদেবী, সুচিত্রা, ইন্দুরেখা, তুঙ্গবিদ্যা এবং চম্পকলতা। ভগবতে এদের অষ্টসখী বলা হয়েছে। রাসমঞ্চে রাধাকৃষ্ণের পাশে শোলার তৈরি এই অষ্টসাথী দিয়ে সাজানো হয়। অনেকের মতে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে আটজন সখীর নাচগানকে অষ্টক বলে।

'মালাকাররা রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব উপলক্ষে রাসমঞ্চ সাজাবার উদ্দেশ্যে 'রাসপট' তৈরি করতেন। এই রাসপটগুলি আকারে বড় এবং চৌক হত। কয়েকটি এই রকম চৌক পট পাতলা কাপড়ে আঠা দিয়ে সংবদ্ধ করা হত। এগুলি ভাঁজ করা যেত। এই সব রাসপটগুলিতে শিশুকৃষ্ণ, শোলার রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, কুঞ্জবন, নদী, শোলার গাছ, পাখি ইত্যাদি আঁকা হত অথবা আঁটানো থাকত। রাস পূর্ণিমার রাতে শোল পট সমন্বয়ে রাসমঞ্চটি অপূর্ব শিল্প সুষমায় ঝলমল করত।'[৪] পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পঁচেটগড়ের রাসে শোলার পট ব্যবহার হয়।

রাসমঞ্চ সাজানোর জন্য শোলার তৈরি পুতুলগুলিকে রাস রচনা বলা হয়, যা চৌদ্দ রকমের হয়। যেমন- পায়রা, কাকাতুয়া, ময়ূর, প্যাঁচা, দাঁড়ে বসা টিয়া, হাঁস, কুমীর, মাছ, গলদা চিংড়ি, হনুমান, আনারস, ভুট্টা, আতা ও তরমুজ।

'রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রদর্শন উপলক্ষ্যে রাস উৎসবের সময় নির্মিত হয় শোলা দিয়ে তৈরি নানান গাছপালা ও সেই সঙ্গে ফুল, লতাপাতা প্রভৃতি। গাছের ডালে ডালে সেজন্য থাকে শোলার তৈরি কাকাতুয়া, টিয়া প্রভৃতি পাখি, আর থাকে কুমীর, হাতি ও ঘোড়ার প্রতিকৃতি। অনুরূপ শোলার কলাগাছে ঝুলতে থাকে শোলার তৈরি কলার কাঁদি ও সেখানে দেখানো হয় এক হনুমান সেই কলার কাঁদি থেকে কলা নিয়ে ভক্ষণরত।'[৫]

শোলার এইসব রাস রচনা তৈরির সময় শিল্পী নান্দনিক ভাবনাকেই গুরুত্ব দেন। শোলার তৈরি নানা পাখি, নানারকম ফল, ইত্যাদি অঙ্গ সৌষ্ঠবগুনে ও রঙ্গের বিন্যাসে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

হাওড়া ও হুগলী জেলার কিছু গ্রামে রাস পূর্ণিমায় শোলার কদমঝাড় তৈরি করা হয়। একে রাসগাছ বলে। রাসগাছের নীচে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রেখে পূজা করা হয়। রাসগাছ ছোট বড় কয়েক প্রকারের হয়। তাতে থাকে কয়েকরকম ফুল, একটি বাঁশের ডগার গাছের সাথে বাঁশের পাতার ডাল লাগানো। ডালটি সুতো দিয়ে বেঁধে ইংরাজি S-এর মতো করা হয়। বাঁশের ডগার সাথে সারিতে পাশে কয়েকটি ডাল থাকে। এভাবে উপরদিকে থাকে থাকে সাজানো হয়। ডালের সাথে শোলার তৈরি কদম, কাঞ্চন, পদ্ম ফুল লাগানো হয়। তখন তাকে ছড়া বলে।

রাসগাছে কটি সারি ছড়া থাকে সেই অনুযায়ী রাসগাছের নাম ও দাম ঠিক হয়। তিন সারি গাছের দাম ২৫০ টাকা এবং পাঁচ সারি গাছের দাম হয় ৩৫০ টাকা। রাসগাছের উপরে থাকে একটা ময়ূর। শোলা কেটে তৈরি ময়ূর গলা উচিয়ে পাখা খুলে পেখম মেলে দাঁড়িয়ে। এটার ভঙ্গিমা রাসগাছকে জীবন্ত করেছে।

একসময় রাস উপলক্ষে মালাকাররা শোলার পুতুল তৈরি করে রাসমঞ্চ সাজাতো তার উল্লেখ্য পাওয়া যায় লেখক কমলকুমার মজুমদারের একটি লেখাতে —

"বাবুদের বাড়ীতে যখন রাস হত, তখন দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসত দেখতে, এক উঠোনেই প্রায় দশটা গ্রাম। মেলা বসত, ভারী জৌলস হত। রাসে ঠাকুরকে সাজাবার সে কী ঘটা! রাশ রাশ ফুল দিয়ে হরেক রকম গহনা করত মালাকাররা। আর দালানগুলো সাজাত শোলার রকমারী পাখী, মিখোস... ফুল দিয়ে, পাখী গুলো হাওয়ায় হাওয়ায় নড়ে সামনে গ্যাসের আলো... মনে হত পাখীগুলো সত্যি... কাকাতুয়াটা যেন এখুনি বলবে - তুই কে তুই কে?... তুই কাদের কুলের বউ গা। অদ্ভুত এক্কেবারে মনে হত না যে সেটা শোলার... সেগুলো শোলার... ঝুটিকা পর্যন্ত হলুদ। তেমনি তার এক ঢাল ন্যাজ! শোলার টিয়াপাখি, শোলার পায়রা। পায়রা টিয়া পাখীগুলো ফুলের দাঁড়ে বসান, বারান্দায় যদি ঝুলোন থাকে, তাহলে সাহস করে বুলবুলি সেখানে এগোবেই না। ভাববে বুঝবিক জ্যান্ত, ঠোকরাতেও পারে। এদিকে মেলাতেও রঙ করা শোলার তৈরি সমস্ত কিছু খেলনা ভারী চমৎকার দেখতে লাগে। বাংলাদেশের শোলার কাজ অন্য অন্য দেশের লোক অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, তারা কিনে নিয়ে যায় ঘরে যত্ন করে রাখে।"[৬]

রাসের দিন কলকাতার বাগবাজারে হঁরিদাস সাহা ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুর দালান সাজানো হয়। ৩০/১ দূর্গাচরণ স্ট্রীট এর এই শ্রী শ্রী রাধেশ্যাম সুন্দর জীউর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন হঁরিদাস সাহা (১৩০১-১৩৫৪) এবং তাঁর পত্নী ৺শ্রী রতি মঞ্জুরী দাসী (১৩০৬-১৩৫০)। রাসের দিন শোলার তৈরি বিভিন্ন রাস রচনা অর্থাৎ পুতুল, পাখি, ভুট্টা, আতা এবং শোলার কদমফুল দিয়ে ঠাকুরবাড়ির দালান সাজানো হয়। শোলার রাসরচনা দিয়ে ইন্দ্রজাল করা হয় এবং দেওয়ালে শোলার কাকাতুয়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, দেখতে খুব জ্যান্ত লাগে।

'একসময় শোলার তৈরি কদমঝাড়ে, শাপলায়, পদ্মফুলে, টিয়া, কাকাতুয়া, ময়ূর, হাঁস, পানকৌড়ি, বাঁদরের মেলায় বৃন্দাবনের রাসরঙ্গ ভূমি রচিত হত। এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। বৃন্দাবনের বনসজ্জা এখন শোলার তৈরি গোটাকতক কদমফুলে আর পাখিতে এসে ঠেকেছে।'

রাসসামগ্রীর মুখ্য উৎপাদন কেন্দ্র : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার রাস উৎসব ও মেলা মহাসমারোহে হয়ে থাকে। যেমন খড়দহের রাস, শান্তিপুরের রাস, কোচবিহার রাজবাড়ির রাস প্রভৃতি।

'খড়দহের গঙ্গাতীরে সতেরো চূড়ার রাসমঞ্চে কার্তিকী পুর্ণিমা থেকে চারদিন ধরে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে চৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভূর পুত্র বীরভদ্র খরদেহে শ্যামসুন্দর জিউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে রাস উৎসব শুরু হয়। উৎসব উপলক্ষে রঙিন আলোর মালা এবং শোলার কদমফুল ও পশুপক্ষির মূর্তি দিয়ে রাসমঞ্চটিকে সুসজ্জিত করা হয়।'

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহেশপুর গ্রামে রাসের সময় রাস সামগ্রী তৈরি হয়। রাসের সময় তারা তৈরি করেন নানা রকম পাখি ও ফল। দাঁড়ে বসা রাসের পাখি তৈরি হয়। কখনো অত্যন্ত সহজ সরল আবার কখনো নিপুনভাবে পাখিগুলি তোইরি করেন। এর মধ্যে কাকাতুয়া, তোতা, ময়না প্রভৃতি অন্যতম। এই রাস রচনাগুলি রাসের দিন বারুইপুর রাস মাঠে বিক্রি হয়। তাছাড়া এই গ্রামের হালদার বংশের রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে রাস উৎসব পালন করা হয়। প্রতিবছর রাসের দিন শোলার তৈরি রাস গাছ, রাস রচনা ও অষ্টসখী দিয়ে মন্দিরের রাধাকৃষ্ণের সিংহাসন সাজানো হয়। এই সাজ সারাবছর থাকে, আবার পরের বছর নতুন করে সাজানো হয়।

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অধীন রামেশ্বরপুর গ্রামে শোলার রাসগাছ তৈরি হয়। রাস উৎসবের সময় হাওড়ার রামেশ্বরপুর, মুন্সিরহাট ও অন্য কয়েকটি গ্রামে এই রাসগাছের চাহিদা হয়। রামেশ্বরপুর গ্রামের শোলাশিল্পী বিবেক দত্ত এই রাসগাছ তৈরি করেন। শোলার তৈরি রাসের কদমগাছগুলির ফুলগুলি, আকারে, রঙে এবং পাপড়ির সুচারু বিন্যাসে নয়নস্নিগ্ধকর হয়ে ওঠে।

'বিভিন্ন জীবজন্ত ও পশুপাখি সহ মানুষের প্রতিমূর্তি তৈরির কাজে একদা হাওড়া জেলার বেলুড়ের নিকটবর্তী বারাকপুরের শোলাশিল্পীদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রতিবছর রাসের সময় এখানে যে মেলা বসে তাতে স্থানীয় শোলাশিল্পীদের তৈরি বেশকিছু শোলার পুতুল খেলনা বিক্রির জন্য আসে। তাছাড়া এখানের রাসউৎসবের শোলার নানাবিধ সজ্জাও রীতিমত দর্শনীয়।'[৬]

হুগলি জেলার পরশুড়ার সুন্দরুষ গ্রামে বেশ কয়েকঘর শোলাশিল্পীদের বসবাস। তারকেশ্বর রেলস্টেশন থেকে শ্যামপুরের অটোতে মজিত তলা / মসজিদ তলা স্টপেজে নেমে সুন্দরুষ গ্রামে যাওয়া যায়। সারাবছর ধরে এই গ্রামে শোলার টোপর, চাঁদমালা, কদমফুল তৈরি হয়। তবে কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমার আগে রাসের জিনিস তৈরি করেন। লক্ষ্মীপুজো শেষ হওয়ার সাথে সাথে রাসের জন্য ব্যবহৃত শোলাসামগ্রী তৈরি করা শুরু হয়ে যায়। তারা মোট চৌদ্দ রকমের রাস রচনা তৈরি করেন। রাসের সময় বিভিন্ন রকম শোলার ফুল তৈরি করেন। প্রথমে ফুলগুলি সাদারঙের থাকে। তারপর সেগুলিকে লাল, হলুদ প্রভৃতি রঙ করা হয়। বাড়ির মেয়েরা এই সব রাস রচনা ও রাসের ফুলগুলি রঙ করা এবং শুকানোর কাজে সাহায্যে করেন। এই গ্রামের কয়েকজন বিখ্যাত শোলাশিল্পী হলেন নিতাইচন্দ্র দাস, কানাইলাল দাস, জগৎতাড়ন দাস ও মাধাই দাস। এই রাসরচনাগুলি কোলকাতার নতুন বাজারের দশকর্মা ও ফুলের দোকানে বিক্রি হয়। এই নতুনবাজারে শোলার জিনিস বিক্রির দোকান আছে নিতাইচরন দাসের। দোকানের নাম শ্রীগুরু ফ্লাওয়ার স্টোর্স। ঠিকানা ৩১৩, রবীন্দ্র সরনী, নতুন বাজার, কলিকাতা – ৬। নিতাইচন্দ্র দাসের চার ছেলেই বর্তমানে এই পেশায় যুক্ত।

শোলাশিল্প ও শিল্পী : শোলাশিল্পী প্রধানত মালাকার সম্প্রদায়ের কাজ। সুন্দরুষ ও রামেশ্বরপুরের যে সমস্ত শিল্পী রাসের জিনিস তৈরি করেন তারা সকলেই মালাকার সম্প্রদায়ের। ব্রহ্মবৈবর্ত পূরাণ অনুসারে মালাকাররা 'নবশাখ' গোষ্ঠীর অর্ন্তগত।

যেমন— মালাকার, কর্মকার, কাংস্যকার, শঙ্খকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, স্বর্ণকার এবং চিত্রকার। এঁরা শিল্পী জাত। এদের মধ্যে সাতটি পদবী হয়। যথা— দে, দত্ত, দাস, পাত্র, ভান্ডারী, নাগ ও মালাকার। তবে এই শিল্পের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও অর্থনীতির উৎস হিসাবে অন্য জাতির মানুষেরাও এই পেশাতে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মহেশপুর গ্রামের শিল্পীরা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। এদের পদবী মন্ডল ও হালদার।

শোলা সংগ্রহ : হাওড়া ও হুগলী জেলার শোলাশিল্পীরা রাসের জিনিসগুলি তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় শোলা হাওড়ার মুন্সিরহাট থেকে সংগ্রহ করেন। মুন্সিরহাটে সোমবার ও শুক্রবার শোলা পাওয়া যায়। এখানে দড়ি দিয়ে মেপে শোলা বিক্রি হয়। দড়ির মাপ দুই থেকে আড়াই হাত, যাকে 'ছোটে' বলা হয়। শোলা কেনাবেচা হয় বান্ডিল দরে। দুই / আড়াই হাত ছোটের বা বোঝার মূল্য ১০০-৪০০ টাকা পর্যন্ত। উৎকৃষ্ট মানের ১০-১২টি শোলার বান্ডিলের মূল্য প্রায় ২০০টাকা। সাধারণত ৮-১২টি শোলা দিয়ে একটি বান্ডিল হয়। বিভিন্ন গুনগতমানের শোলার বিভিন্ন দাম। শোলা মোটা না সরু এর উপর শোলার দাম নির্ভর করে। সরু শোলার দাম মোটা শোলার থেকে কম। সরু শোলার বান্ডিলে অনেক বেশী শোলা থাকে। মহেশপুরের শোলাশিল্পীরা স্থানীয় পুকুরিয়া হাট থেকে শোলা সংগ্রহ করে। এই হাটে প্রতি শনিবার সকাল পাঁচটা থেকে আটটা অবধি শোলাশিল্পের কাঁচামাল কেনাবেচা হয়।

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি : রাস উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় শোলা সামগ্রীগুলি তৈরি করতে শিল্পীরা বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করেন। প্রধান যন্ত্রপাতিগুলি হল শোলাকাটার ছুরি বা কাত, ছোট আকারের কয়েকটা ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ বা সুচ ইত্যাদি। এই কাজে ব্যবহৃত প্রধান উপকরণগুলি হল শোলা, রঙ এবং তুলি, আঠা, সুতো, বাঁশের সরু কাঠি, খবরের কাগজ ও বিভিন্ন রঙিন কাগজ ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : শোলার রাস সামগ্রী তৈরি করতে সাধারণত দুটি শিল্প পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যথা - (১) ভাস্কর্য পদ্ধতি বা খোদাইয়ের কাজ (Engraving) এবং (২) চিত্রকলা পদ্ধতি (Painting)। রাস উৎসবে রাসমঞ্চ সাজানোর জন্য যে কাকাতুয়া, ময়ূর, দাঁড়ে বসা টিয়া, কুমীর, আতা, ভূট্টা ইত্যাদি লাগে তা তৈরি হয় ভাস্কর্য পদ্ধতির মাধ্যমে। তীক্ষ্ণ এবং ধারালো ছুরি (কাত) দিয়ে নরম শোলারপাতা ও শোলার খন্ডের উপর খোদাইয়ের মাধ্যমে এই সব সামগ্রীগুলি তৈরি হয়। অপরদিকে রাসমঞ্চে যে রাসপটগুলি দিয়ে সাজানো হয় সেগুলি চিত্রকলা পদ্ধতিতে তৈরি। শোলার পাতলা চাদরের উপরে রঙ ও তুলির টানে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার জীবনের বিভিন্ন কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়। সমস্ত কিছুই শোলা শিল্পী তার নান্দনিক দক্ষতায় মূর্ত করে তোলে।

পুকুরিয়া হাট বা মুন্সিরহাট থেকে সংগ্রহ করা শোলা সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। শোলাগাছকে মাপ মতো খন্ড করে কেটে নিতে হয়। শুকনো শোলা গাছের কান্ডটির উপরের বাদামি ছাল বা খোসাটি ছড়িয়ে ভিতরের কার্যোপযোগী সাদা অংশ বার করে নিতে হয়। এই কাজের জন্য শিল্পীরা কাইত নামে ধারালো ছুরির সাহায্য নেন। বেলনাকার শোলার সাদা টুকরো থেকে কাগজের মতো পাতলা চাদর কেটে বার করা হয়। এই শোলা পাতা (Solar paper) বলা হয়। শোলার এই পাতলা চাদরকে উপযুক্ত আকারে কেটে বিভিন্ন শোলা সামগ্রী তৈরি করা হয়। একটি শোলার পাত ছয় থেকে দশ ফুট লম্বা হয়। প্রয়োজনমত একটি পাতের সঙ্গে আরেকটি জুড়ে কুড়ি থেকে ত্রিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা করা হয়। এই লম্বা পাতাকে গুটিয়ে রাখা হয়, দেখতে ঠিক গোটানো ফিল্মের মত লাগে। শোলাকে কেটে যে টুকরো তৈরি করা হয় তার নামগুলি হল কুশি, গুনো, ঢ্যাপ, পাতি, চরণ ইত্যাদি। এই নামগুলি টুকরোর আকার ও কাজের সুবিধার কথা ভেবে দেয় কারিগরেরা। সাধারণত শোলা গাছের আড়ের গোল অংশ মাপ মতো কেঁটে ছেঁটে বের করা হয় ঐ নামের টুকরো গুলো। প্রত্যেকটি টুকরোর আকার আলাদা হয়। এই শোলা পাতা ও শোলা টুকরোগুলির উপর শোলাশিল্পীরা খোদাইয়ের মাধ্যমে এবং চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে তৈরি করেন অসাধারণ সব রাসের শোলা সামগ্রী।

প্রতিটি শিল্প তার বিক্রয়পদ্ধতি এবং বাজারের ওপর টিকে থাকে। প্রতিটি শিল্পকেই তাই নিজের বাজার ধরতে হয়। মালাকার সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি তাদের শোলাশিল্পের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সারা বছর ধরে তাঁরা শোলার নানারকম সামগ্রী তৈরি করলেও রাসের এক মাস আগে থেকে তারা শোলার রাস রচনা, শোলার কদমঝাড় ও ফুল তৈরি করেন। সকল মালাকার পরিবার এই সময় রাসের সামগ্রী তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন। তাদের তৈরি সামগ্রী গুলো তাঁরা গ্রাম ও শহরের দশকর্মা দোকানদারদের কাছে বিক্রি করে আসেন। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দশকর্মা দোকান থেকে মালাকারদের তৈরি জিনিসগুলো কেনেন।এভাবে নতুন একটা অর্থচক্র গড়ে উঠেছে। যার একদিকে মালাকার শিল্পীরা এবং অপরদিকে সাধারণ

ক্রেতা। সুন্দরুষ গ্রামের মালাকার শিল্পীরা যেমন তৈরি সামগ্রীগুলো নিজেদের কলকাতার নতুন বাজারের দোকানে বিক্রি করেন। রাসের সময় কলকাতা ও শহরতলীর সাধারণ ক্রেতা এই দোকান থেকে শোলার রাস রচনা ও শোলার ফুল কিনে নিয়ে যান। কিছু সময় দেখা যায় অনেকে মালাকার শিল্পীদের বাড়ি থেকেও এসে সরাসরি রাসের শোলাসামগ্রী কিনে নিয়ে যান। তবে গ্রামের লোক ও পরিচিত ছাড়া বাড়ি থেকে সরাসরি বিক্রি হয় না। কখনও কখনও এই শিল্পীরা বড় মন্দির বা রাসমঞ্চ সাজানোর অর্ডার নেন। রাসের আগের দিন সেখানে গিয়ে নিজেদের হাতে শোলাসামগ্রী দিয়ে রাসমঞ্চ সাজিয়ে দিয়ে আসেন। আগে প্রত্যেক মালাকারদের নিজেদের যজমান ছিল। তারা তাদের তৈরি জিনিসগুলি যজমানের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। মূলত যজমানের থেকে এরা চাল ও টাকা পান। তবে বর্তমানে যজমানী প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে। যজমানরা অনেক সময় দোকান থেকে শোলা সামগ্রী সংগ্রহ করে নিচ্ছেন।

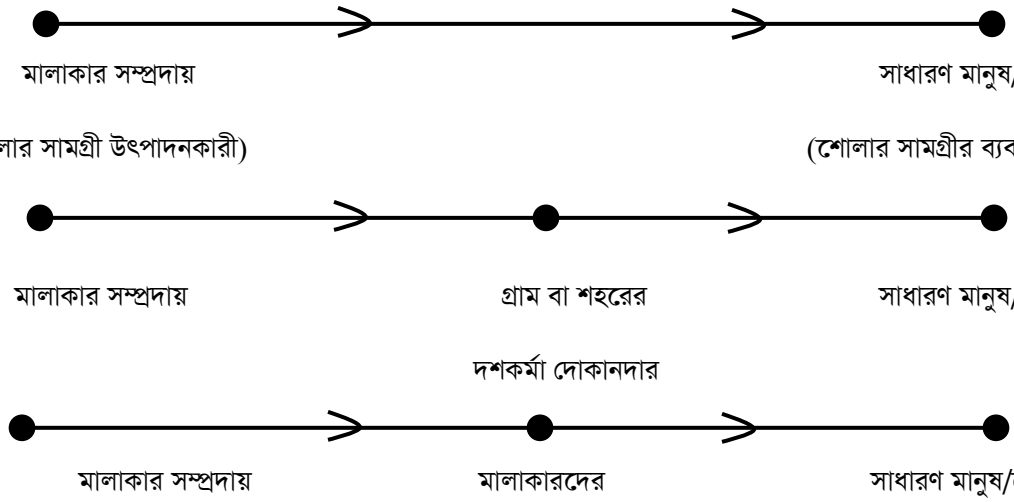

উপসংহার : আধুনিকতা ও বিশ্বায়ন রাসের সময় এই সকল শোলাসামগ্রীর ব্যবহার কমে আসাকে তরান্বিত করছে। রাসমঞ্চ সাজানোর জন্য শোলার ফুল ও রাস রচনার পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক বিভিন্ন আলোর ব্যবহার করা হচ্ছে।

শোলাশিল্পকে আগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হত না। শোলার ছিল একচেটিয়া চাহিদা ও বাজার। আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। শোলার স্থান দখলের জন্য এসেছে থার্মোকল। রাসমঞ্চ সাজানোর কাজে এবং রাসপট আঁকার জন্য এখন শোলার পরিবর্তে থার্মোকল বেশি পরিমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সব কারণে মালাকারদের পৈতৃক পেশা আজ বিপন্নতার সম্মুখীন।

শোলার রাস সামগ্রীগুলিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহারের ব্যবহারের পাশাপাশি ঘর সাজানো দ্রব্য ও খেলনা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশু মনোরঞ্জনের জন্য বর্তমানে বিদেশী খেলনার রমরমা। কিন্তু দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি শোলার পশুপাখি, শোলার ফল ইত্যাদি শিশুদের খেলনা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১। চৌধুরী, ড. দুলাল ও ড. সেনগুপ্ত পল্লব (সম্পাদক) ২০১৩ *লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, প্রকাশনা পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা, পৃ- ৩২৪।

২। চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার (সম্পাদক) ২০১২ *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, প্রকাশক অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড, কোলকাতা, পৃ- ৫৫০।

৩। সরকার, মঞ্জুলা ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ *অনবদ্য শোলা-শিল্প,* সমকালীন, চতুবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় সম্পাদক আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা, পৃ- ১১৪-১১৮।

৪। বড়পন্ডা, দীপককুমার ২০১৩ *শোলার পট,* লোকশ্রুতি, ভল্যুম ১১ সংখ্যা ১, প্রকাশক লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা, পৃ- ১৫০।

৫। সাঁতরা তারাপদ ২০০০ *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পী সমাজ,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা, পৃ- ৬১-৬৬।

৬। মজুমদার, দয়াময়ী ও সন্দীপন ভট্টাচার্য (সম্পাদক) ১৪০৫ বঙ্গাব্দ *কমলকুমার মজুমদার-বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* প্রকাশক দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কোলকাতা, পৃ- ৯৩।

৭। মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ ২০০৭ *বাংলার লোক উৎসব ও লোকশিল্প,* প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কোলকাতা, পৃ- ১৫২।

৮। বিশ্বাস, বিধান ২০০৮ *শোলাশিল্প,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা, পৃ- ৫০।